ইয়াঙ্গুন ভ্রমণকথা

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

মিয়ানমার বা বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন বা ইয়াঙ্গুন। আমাদের নিকটতম দুই প্রতিবেশির একটি। ভৌগোলিকভাবে নিকটতম হলেও রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে অনেক দূরে। তার ওপর তৈরি হয়েছে 'রোহিঙ্গা সমস্যা'। সম্পদে সমৃদ্ধ বিশাল আয়তনের দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বৈরশাসনের মধ্যেই আছে বহুবছর, সেইকারণে দারিদ্র আর বঞ্চনায় তা বাংলাদেশের চাইতেও পেছনে। দুই দেশের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক উভয়ের জন্যই প্রয়োজনীয়। এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে ইয়াঙ্গুনের মানুষদের কথা জানবার সুযোগ হলো।

বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-ইয়াঙ্গুন ফ্লাইটে বসে ছিলাম। মানুষজন দেখছিলাম। ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা বিমানের কানেক্টিং ফ্লাইট থেকে নেমে মিয়ানমারের মুসলিমরা উঠছিলেন সেই ফ্লাইটে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ওমরাহ্ হজ করে ফিরছিলেন। মহিলাদের গায়ে বোরখা আর পুরুষদের বেশির ভাগই লুঙ্গি পরা। মিয়ানমার সম্পর্কে যতটুকু জানি তাতে বিমানে এ ধরনের মানুষের আধিক্য আমাকে একটু বিস্মিত করেছিল। মিয়ানমার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রধান দেশ বলে জানি। আরো জানি যে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কও শীতল। সম্পর্ক আছে, কিন্তু সীমিত। অথচ বাংলাদেশ বিমানের এই ফ্লাইটটি ছিল ফুল। এবং বার্মিজ চেহারার লোকজনও ছিল একেবারেই কম। হাতে গুনলে দু-একজনকে পাওয়া যেতে পারে, যাঁদের চেহারা বার্মিজদের টিপিক্যাল চেহারার মতো। আমি বসে বসে তাঁদের প্লেনে ওঠা দেখছিলাম। প্রায় প্রতিটি যাত্রীর হাতে একটা-দুটো করে বাংলাদেশি মিষ্টির প্যাকেট দেখা যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম, ডিউটি ফ্রি থেকে কেনা এইসব মিষ্টির ভালো চাহিদা আছে মিয়ানমারে। রসগোল্লার কথা ভাবতে ভাবতে দেখি একজন বাঙালি ঢুকছেন। মাথায় টাক। কিন্তু খুব পরিচিত চেহারা। কোথায় যেন দেখেছি। বসলেন আমাদের পেছনে। টিভিতে দেখেছি কি উনাকে অনেকবার? আধ মিনিট লাগল বুঝতে যে ইনি হলেন আমাদের জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী। আন্দাজ করছিলাম উনি হয়তো সরকারের পক্ষ থেকে জ্বালানি বিষয়ক কোনো কাজে যাচ্ছেন। উনার সাথে আরো চার-পাঁচজন কেতাদুরস্ত সঙ্গী ছিলেন। ঠিক কতজন মনে করতে পারছি না। কেন কে কোথায় যাচ্ছেন ভাবতে ভাবতে দেখি তৌফিক ইলাহীর এক সঙ্গী এসে বসলেন আমার পাশে। কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম জানতে যে জ্বালানি উপদেষ্টা কী বিশেষ উদ্দেশ্যে মিয়ানমার যাচ্ছেন।

প্লেন ছাড়ল যথাসময়ে। মনে মনে ভাবছিলাম পৃথিবীর কোনো দেশ বোধ হয় তার পাশের দেশ সম্পর্কে এত কম জানে না, যতটুকু আমরা বাংলাদেশিরা জানি মিয়ানমার সম্পর্কে। এবং এর কারণ হলো মিয়ানমার সম্পর্কে গণমাধ্যমগুলো আমাদের খুব কমই জানতে দিয়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি আমাদের জীবনকালে এত বেশি সামরিক শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যে সে দেশে যে এখনো গণতন্ত্রচর্চা আসলে কী অবস্থায় আছে, সে সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষদের মনে এখনো ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে। আর তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষদের ধারণা থেকেই। এমনকি মিয়ানমারের মতো দেশ, যা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত, সে দেশের জ্বালানি সম্পদ তাদের দেশে কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা খুব সীমিত। আর সে কারণেই এই প্লেনে তৌফিক-ই-ইলাহীর উপস্থিতি আমাকে কিছুটা কৌতূহলী করে তুলেছে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার মিয়ানমার ভ্রমণ প্রথমে এই জ্বালানি বিষয়ক প্রশ্ন দিয়েই শুরু হোক।

এমনকি মিয়ানমারের মতো দেশ, যা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত, সে দেশের জ্বালানি সম্পদ তাদের দেশে কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা খুব সীমিত।

আমার পাশে বসা ভদ্রলোকের সাথে কথা দিয়েই শুরু করা যাক। পরিচয় পর্বে জানতে পারলাম, তিনি সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশের একটি প্রাইভেট মবিল কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। এবং আরো জানতে পারলাম যে অন্য আরো সদস্যরা মিলে একই সাথে মিয়ানমার যাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে মবিল মিয়ানমারে রপ্তানি করতে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায়। অর্থাৎ এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য মিয়ানমারের মবিল মার্কেটে প্রবেশের ক্ষেত্র তৈরি করা।

মনে আছে ২০১০ সালে মিয়ানমারে নির্বাচনের সময় সারা পৃথিবীতে এমনভাবে তোলপাড় পড়ে যায়, মনে হয় যেন মিয়ায়নমার থেকে তৈরি হওয়া গণতন্ত্রের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে পৃথিবী। পৃথিবীজুড়ে সাংবাদিকরা দলে দলে মিয়ানমার পৌঁছতে থাকেন এই নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেদন করতে। আরো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মিয়ানমারের ওপর এমবার্গো তুলে নেওয়ার ঘটনা। ঠিক এখন যেমন কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ ও বাণিজ্যের বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে, তেমনি ২০১১-১২ সালে যে কোনো বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টালেই অথবা টিভি খুললেই দেখা যেত অং সান সু চির খোঁপায় ফুলওয়ালা কোনো একটি ছবি। আর সেইসব ছবি দেখে মনে হতো, এই খোঁপার ফুলেই লুকিয়ে আছে গণতন্ত্রের ভোমরা। প্লেনে উঠে এইসব কথা ভেবে চলছিলাম এ কারণে যে মিয়ায়নমারে নির্বাচনের পর সারা পৃথিবীর দেশগুলো নানাভাবে মিয়ানমারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তৌফিক ইলাহী ও তাঁর দলের প্লেনে এই উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশও নতুন ব্যবসার সুযোগ সন্ধানে পিছিয়ে নেই। আমি ধারণা করেছিলাম, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, আইসিটি সেক্টরের ব্যবসায়ীরা মূলত মিয়ানমারের বাজার ধরতে আগ্রহী। জ্বালানির দেশে জ্বালানি রপ্তানি করবে বাংলাদেশ–এ ধারণা একবারের জন্যও মাথায় আসেনি। আবার একই সাথে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম, দীর্ঘদিন সামরিক

শাসনের ভেতর থেকে মিয়ানমার এখনো নিজস্ব সক্ষমতা তৈরির চেয়ে নিজেকে বাজার হিসেবেই আগে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর বোধ হয়। তা না হলে মিয়ানমারের কেন নিজস্ব মবিল তৈরির সক্ষমতা থাকবে না? না, আমি মিয়ানমার সম্পর্কে ঠিক ততটুকু জানি না, যতটুকু জানলে এমন একটি উপসংহারে উপনীত হওয়া যায়। দেখা যাক এই ভ্রমণ আমাকে কী দেখায়।

ইয়াঙ্গুন এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আমার একটু স্বভাব আছে যে কোনো নতুন দেশে পৌঁছে বাতাসের ঘ্রাণ পরখ করার। ইয়াঙ্গুন শহরে আমি পরিচিত মাটি, ফুল, ফল, উদ্ভিদের ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। আর মনে হচ্ছিল, এই ঘ্রাণ বাংলাদেশের বাতাসের ঘ্রাণের একটা সান্ধ্য সংস্করণ। ট্যাক্সিতে করে যখন হোটেলের দিকে যাচ্ছি, মনে হচ্ছিল এই শহর একটা প্রাচুর্যের শহর। খুব উঁচু বিল্ডিং চোখে পড়ল না। রাস্তাঘাটে ট্রাফিক জ্যাম একেবারেই নেই। ম্যানসনের মতো কিছু বাড়ির সামনে বিশাল গেট দেখেই বোঝা যায়, যেদিক দিয়ে যাচ্ছি সেদিক দিয়ে ধনীদের বাড়িঘর। কোনো দারিদ্র্য তো চোখে পড়লই না, বরং মনে হলো কানাডার কোনো ছোট্ট শহর, এবং সময়-ঘড়িতে ভ্রমণ করলে হয়তো এই শহরের সাথে মিল পাওয়া যাবে ৩০ বছর আগের ঢাকার। সামনে বারান্দাওয়ালা দোতলা বাড়ির সামনে লতানো ফুলগাছের ডালপালা। এইসব বাড়িঘরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়ার বাড়িঘরেরও। যে হোটেলটিতে আমরা উঠলাম সেটির নাম ক্যান্দাওয়াজি প্যালেস। হোটেলের সামনে ট্যাক্সি পার্ক করার সময় মনে হলো একটা কাঠের রাজপ্রাসাদে ঢুকছি। সামনে বিচিত্র ধরনের পুরনো বড় বড় গাছ আর অর্কিডের সমারোহ। ঠিক হলো, এই হোটেলেই থাকব পাঁচ দিন। আমি আর অমি রুমে স্যুটকেস রেখে এসে লবিতে বসলাম এবং লক্ষ করলাম, যাঁরা এই হোটেলে উঠেছেন তাঁদের বেশির ভাগই বিদেশি। ইউরোপীয় থেকে শুরু করে চায়নিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান এবং আমেরিকান নাগরিকদের উপস্থিতিই বেশি লক্ষ করা গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছুটি কাটাতে এলেও বেশির ভাগই কোনো না কোনো ব্যবসার কাজে এসেছেন। তাঁদের বসার ভঙ্গি, খাওয়ার ভঙ্গি এবং সঙ্গের সঙ্গী দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁরা বিশেষ কী ধরনের ট্যুরিজমে এসেছেন। এও বোঝা গেল যে এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেকেরই মিয়ানমারের এনজিও কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে নানা মাত্রায়।

হোটেলের রিসেপশনে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে দু-একজন ইংরেজি ভাষা জানলেও বেশির ভাগ ইংরেজি বোঝেন না। বোঝা গেল, দীর্ঘ সময় ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকেও ইংরেজি জানা ও কথা বলার ব্যাপারে থাইল্যান্ডের জনগণের মতো এদের মধ্যেও তেমন কোনো তাড়না কাজ করে না। রাতের বেলা হোটেলটা দেখে ইয়াঙ্গুন সম্পর্কে যতটুকু আন্দাজ করা গেল তা এখনকার সময়ের যে কোনো শহরের বাস্তবতার চাইতে ভিন্ন কিছু নয়। অর্থাৎ বিদেশি ট্যুরিস্টদের জন্য জায়গাটিকে এমন একটি আদলে নির্মাণ করা হয়েছে বা এর সেবা ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যার জন্য এই হোটেলকে পৃথিবীর আর দশটি দেশের হোটেলের চেয়ে আলাদা করা যাবে না। বিশ্বায়নের কারণে পৃথিবীর অন্য প্রধান শহরগুলোর ঠিক যা হবার কথা ছিল, যে ধরনের খাবার, পানীয়, সার্ভ করার ধরন, ওয়েটারদের আচরণ হবার কথা ছিল, এখানেও ঠিক তা-ই। শুধু যা ভিন্ন তা হলো একটা সোঁদা ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণের টানে আমি হোটেলের চারদিকটা একটু লক্ষ করতে বের হলাম রাতেই। দেখি হোটেলের ঠিক পাশ দিয়ে রয়েছে একটা লেক। এবং বুঝলাম, এই সোঁদা ঘ্রাণটি আসছে ওই লেক থেকেই।

পরদিন সকালে উঠে ট্যাক্সি নিয়ে বের হতে গিয়ে হোটেলটা আরো ভালোমতো লক্ষ করলাম। আমি এই হোটেলে থাকার মতো ধনী নই। শুধু স্বামীর কাজের সুবাদে এখানে থাকার সুযোগ হয়েছে, এই আর কি। ট্যাক্সিতে উঠে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে আলাপের সময় জানতে পারলাম, আমরা যে হোটেলে আছি সেই হোটেলের মালিক মিয়ানমারের গুটিকয়েক খুব-ধনীদের একজন। এই এক মালিকেরই মিয়ানমারে এরকম বা তার কাছাকাছি মানের আরো পাঁচটি হোটেল রয়েছে, এবং শুধু তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যই নতুন মডেলের প্রায় ৫০টি গাড়ি রয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্য গাড়ির হিসাব করলে সেই সংখ্যা ১০০ও পার হতে পারে। আমি ড্রাইভারের কথা শুনছিলাম। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে আমাদের এইসব তথ্য দিচ্ছিল। ৫০ বা ১০০–কোনো সংখ্যাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। মনে হলো এই যে একজন ট্যাক্সিচালক একজন ধনী ব্যবসায়ী সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করে, এটাই যথেষ্ট এই শহরের শ্রেণিভেদে মানুষের জীবন-যাপনের ধরন বোধগম্য হওয়ার জন্য। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের আরো জানাল যে এই হোটেলের মালিকের সাথে সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ খুব ভালো। আর তাই তাঁর পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বোঝা গেল, সামরিক বাহিনীর সাথে ভালো বোঝাপড়া না থাকলে কারো পক্ষে এই মাত্রায় সম্পদ আহরণ সম্ভব নয় তা এদেশের ট্যাক্সিচালক থেকে শুরু করে হোটেলের ওয়েটার, দোকানদার, কৃষক, শ্রমিক–সকলেই জানে। আর এ থেকেই বোঝা যায়, সামরিক শক্তি যতটা লজ্জাহীনভাবে মুষ্টিমেয় ধনীদের সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে, ঠিক ততটাই বেপরোয়া তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং তাদের পছন্দের সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে।

বোঝা গেল, সামরিক বাহিনীর সাথে ভালো বোঝাপড়া না থাকলে কারো পক্ষে এই মাত্রায় সম্পদ আহরণ সম্ভব নয় তা এদেশের ট্যাক্সিচালক থেকে শুরু করে হোটেলের ওয়েটার, দোকানদার, কৃষক, শ্রমিক–সকলেই জানে।

২.

আমি এই লেখায় ইচ্ছা করেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করব না বলে ঠিক করে রেখেছি। এর কারণ আমি ভীত তা নয়, এর কারণ আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করব তাঁরা যেন কখনো আমার লেখার কারণে বিপদে না পড়েন। স্থান-কাল-পাত্র উহ্য রেখে আমাকে এই ভ্রমণকাহিনী লিখতে হবে তা মনে করিনি আগে কখনো, কিন্তু লিখছি এ কারণে যে আমার চোখে আমি যা দেখেছি এই ভ্রমণে তার অনেক কিছুই মিয়ানমারকে বুঝতে প্রাসঙ্গিক মনে করি বিভিন্ন কারণে। এই ভ্রমণে আমার সাথি হয়েছেন যাঁরা তাঁদের বেশ কয়েকজন আগে মিয়ানমার ঘুরে গেছেন বা তাঁদের মিয়ানমারের সাথে কাজের যোগাযোগ ছিল বিধায় তাঁদের উপদেশ-অনুরোধে আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে। আবার আমি ঠিক যেভাবে এই শহরটিকে বুঝতে চেয়েছি, তার জন্য বিদেশি নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে এদেশের সাথে বিদেশের মানুষদের সম্পর্ক বুঝতেও সাহায্য করেছে।

যে পাঁচ দিন আমরা ইয়াঙ্গুনে ছিলাম তার মধ্যে দুই দিন আমি সম্পূর্ণ একা ঘুরেছি। এর মধ্যে এক দিন আমি ট্রেনে করে ইয়াঙ্গুন

শহরের চারদিকে চক্কর দিয়ে এসেছি তিন ঘণ্টায়। এই ট্রেনটিকে বলা হয় সার্কুলার ট্রেন বা সার্কেল লাইন ট্রেন। ইয়াঙ্গুন রেলস্টেশনটি বেশ বড়। সামনের পার্কিংয়ের জায়াগায় গেলে মনে হবে ১৫ বছর আগের কলকাতার রেলস্টেশন। দক্ষিণ এশিয়ার রেলস্টেশনগুলো সম্ভবত একই সময়ে বানানো এবং এগুলোর স্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকার কারণ ব্রিটিশ প্রভাব। তবে একটা বিষয় স্বীকার করতেই হয় যে এই স্টেশনটি এত বড় হলেও কলকাতা, দিল্লি বা এমনকি ঢাকার স্টেশনের মতো এত ব্যস্ত নয়। কারণটা বোঝা খুব সহজ। মিয়ানমারের জনসংখ্যার ঘনত্ব (১৯২/বর্গমাইল) ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্বের (৯৫৩/বর্গমাইল) প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ, আর বাংলাদেশের (২৪৯৭/বর্গমাইল) প্রায় ১২ ভাগের এক ভাগ। আমি যখন ট্রেনে উঠেছি তখন দুপুর ১২টা। ট্রেন স্টেশনে পৌছামাত্র বোঝা গেল, বিদেশিদের দেখে অভ্যস্ত এখানকার মানুষ। তাই ইংরেজি না জানলেও কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই সবাই একদিকে পাঠিয়ে দেয়। এবং বোঝা যায়, ট্যুরিস্টরা এখানে এলে প্রথমেই একটা কাউন্টারে যায়। যেখান থেকে সার্কুলার ট্রেনটা ছাড়ে, সেই প্ল্যাটফর্মেই একটা ছোট ঘর আছে মাঝখানের দিকে। সেখানে চেয়ারে পা তুলে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা একটি লোক বসে আছে সামনে একটা বিশাল রেজিস্টার খাতা নিয়ে। ওই ঘরে বসে যে আরেকজন লোকের সাথে কথা বলছে তার হাতে চায়ের কাপ। ট্যুরিস্ট দেখলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তারা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে কথা বলছে।

আমি দেখলাম, এখানে যারা আজকে এই ট্রেনে করে ঘুরতে বের হবে তাদের বেশির ভাগই পশ্চিমা দেশ থেকে আসা পর্যটক। কেউ ইউরোপীয়, কেউ আমেরিকান। দক্ষিণ এশিয়ার কেউ নেই আমি ছাড়া। সবাই ভাব বিনিময় করে টিকিট কিনছে এবং কখন কী করতে হবে বুঝতে না পেরে বা বোঝার চেষ্টা না করে দিব্যি বসে আছে। এই দৃশ্য আমার কাছে খুব পরিচিত। যাদের হাতে অনেক সময়, যারা জীবন নিয়ে খুব জটিল চিন্তায় নেই, তাদের তাড়াহুড়াও নেই। এদিক-ওদিক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে। কখনো প্ল্যাটফর্মের ভাসমান মানুষের ছবি, কখনো পুরনো খালি প্ল্যাটফর্মের ছবি, পুরনো অকেজো ঘড়ি, অথবা লুঙ্গি পরা পরিশ্রমী মানুষের গতিবিধি, অথবা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদাস চাহনি। একেকজনকে একেকটি বিষয় আকর্ষণ করছে। যার কাছে যা কিছু নতুন, অদ্ভুত বা ব্যতিক্রমী মনে হচ্ছে, সে তা-ই দেখছে। আর আমি? হ্যাঁ, আমি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই বিশাল স্টেশন দেখে ভাবছি অন্য কিছু। এই ট্যুরিস্টদের কাছে এই গরিবত্ব, অকেজো পুরনো ঘড়ি, লুঙ্গি পরা গা হেলিয়ে থাকা আরামপ্রিয় মানুষ, ছাদের ওপর থেকে ঝুলতে থাকা ১০০ বছর আগের ফ্যান–সবই এক্সোটিক মনে হয়। ব্রিটিশ আধিপত্যের এই দীর্ঘ ছাপ দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই কোনো পরিচিত স্থানের সাথে মিল পান। তুলনা করেন হয়তো অন্য শহরের স্টেশনের সাথে, যেমনটি আমিও ভেবেছি কিছুক্ষণ আগে। এইসব মানুষ আসে-যায়, কিন্তু যে মানুষগুলো এখানে দরিদ্রের জীবন যাপন করে, তাদের কখনোই দেখতে যাওয়া হয় না বিদেশ। তাদের জন্য আছে টেলিভিশন। এভাবে আরো প্রায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর একটা ট্রেন এলো। বিদেশিদের উদ্দেশ্য করে একজন লোক ইশারা করল। বলল ট্রেনে উঠতে। ট্রেনে উঠতে গিয়ে দেখি, আমরা যারা ট্যুরিস্ট উঠেছি তারা প্রায় পাশাপাশি বগিতে উঠেছি। আমি বিদেশিদের থেকে একটু দূরে বসার চেষ্টা করলাম। কারণ আমি চাইছিলাম আমার সাথে লোকাল লোকজন বসুক। কিন্তু আমি সিটে বসার পর ২২-২৩ বছর বয়সী এক আমেরিকান মেয়ে আমার সামনের সিটের দিকে দেখিয়ে বলল, এখানে বসতে পারি? আমি বললাম, অবশ্যই। সে আমার উল্টো দিকে বসে পড়ল। তারপর একটা সানগ্লাস পরে বাইরে তাকিয়ে রইল। শুরু হলো আমাদের রেল ভ্রমণ। কথা প্রসঙ্গে মেয়েটির কাছ থেকে জানতে পারলাম, সে থাইল্যান্ডে একটা স্কুলে ইংরেজি পড়াতে এসেছে। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছে মিয়ানমার ভ্রমণ করতে। উঠেছে ১২ ডলারের একটা হোটেলে। যেহেতু সে নিজে একজন শিক্ষার্থী আর তার বাজেট খুব কম, তাই সে এই ১২ ডলারের হোটেলে থেকেই ইয়াঙ্গুন শহর দেখতে বের হয়েছে। মেয়েটিকে আমি নাম জিজ্ঞেস করিনি, সেও জিজ্ঞেস করেনি আমার নাম। কিন্তু তিন ঘণ্টা আমরা একসাথে ছিলাম। পানি, জুস শেয়ার করলাম। গরম লাগার অনুভূতি প্রকাশ করলাম। ক্যামেরায় ছবি তুললাম।

ট্রেন ছাড়ার পর যে দৃশ্যগুলো আমার চোখে পড়ল, সেগুলো কোনোভাবেই ঢাকার ট্রেনে চড়ে দেখা দৃশ্যের সাথে তুলনা করলে আলাদা কিছু বলা যাবে না। গত দুই দিন আমি যে শহর দেখে এসেছি তার সাথে ইয়াঙ্গুন শহরের সীমানায় কী আছে তার কোনোই মিল নেই। সুন্দর সুন্দর গেটওয়ালা একতলা-দোতলা বাড়ি এই দৃশ্যপটে একেবারেই অনুপস্থিত বলা চলে। ট্রেনের লাইন ঘেঁষে বস্তির পর বস্তি, মাঝে মাঝে বাজার, কালভার্ট, পরিচর্যার অভাবে পড়ে থাকা খোলা মাঠ, যেখানে-সেখানে হঠাৎ কোনো উঁচু গাছ, প্যাগোডা, খোলা জায়গা। ঢাকার মতো ছালা দিয়ে বানানো টয়লেট, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষের বসবাস, দৈনন্দিন জীবনে পথেঘাটে বসা খোলা বাজার, বস্তির ছোট্ট ঘরের ফুলেল প্রিন্টের পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া কোনো শিশুর মুখ, ফলের খাঁচি মাথায় গৃহিণী ও তার হাত ধরে হাঁটতে থাকা শিশু, বাজারে কাঁচা মাছ নিয়ে বসে থাকা মাছ বিক্রেতা–এইসব দৃশ্যই আমাদের পরিচিত। তফাত শুধু মানুষের পরনের কাপড়ে। পুরুষরা লুঙ্গি পরা এবং মহিলারা বিশেষ ধরনের লুঙ্গি এবং কোমর পর্যন্ত লম্বা ব্লাউজ পরা। কোথাও কোথাও চোখে পড়বে মাথা ন্যাড়া গেরুয়া বসনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের।

মিয়ানমারের জনসংখ্যার ঘনত্ব (১৯২/বর্গমাইল) ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্বের (৯৫৩/বর্গমাইল) প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ, আর বাংলাদেশের (২৪৯৭/বর্গমাইল) প্রায় ১২ ভাগের এক ভাগ।

প্রচণ্ড গরম। মাথা থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে আর খোলা জানালা দিয়ে আসছে ধুলা। একেকটি স্টেশনে যখন ট্রেন থামে তখন সিমেন্টের ফলকের গায়ে ইংরেজিতে লেখা দেখা যায় স্টেশনের নাম। আমাদের দেশের ফলকের সাথে এই ফলকের কোনো পার্থক্য নেই। তিন ঘণ্টায় ৩৯টি স্টেশনের মধ্যে কয়েকটি স্টেশনে একটা জিনিস দেখে আমি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বিশেষ করে ছোট স্টেশনগুলোতে দেখা যায় একটা ছোটখাটো বিশ্রাম নেওয়ার বা বসার স্থান। আর তার এক কোণে থাকে ছোট মাটির কলস বা বড় মাটির পাতিল সরা দিয়ে ঢাকা। কোনো কোনো জায়গায় আবার এইসব পানির পাতিলের পাশে রাখা থাকে গ্লাস। প্রথমে এটা চোখে পড়লেও বুঝতে পারিনি ঘটনা কী। কয়েকটা স্টেশন পার হবার পর বুঝতে পারলাম যে এটা পথিকদের জন্য রাখা পানি। মনে পড়ল আমি জানতাম সাধারণত দর্শনার্থীদের জন্য প্যাগোডার বাইরে এরকম পানি রাখা হয়। এখন দেখছি পাবলিক প্লেসে এরকম পানি রাখা হয়। তখন মনে হলো এই যে আমি ট্রেনের জানালা দিয়ে টিভি

দেখার মতো দেখছি মানুষের দৈনন্দিন জীবন, এর মধ্য দিয়ে আমি আসলে এই শহরকে বুঝতে পারছি না। আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, এই পাতিলের ভেতর পানির উৎস কী? কে এসে রেখে যায় পানি? তখন না জানলেও পরে জানতে পেরেছি, এই পাতিলের পানিগুলো সংগ্রহ করে রাখে ভিক্ষুরাই। আর এ ধরনের রেলস্টেশনে পানি রাখার কারণ হচ্ছে কোনো ট্যাপের পানি বা বাথরুম ওই ছোট স্টেশনগুলোতে নেই। প্রচণ্ড গরমে যখন চারদিক খাঁ খাঁ করে এক ফোঁটা পানির জন্য, তখন যাত্রীদের হয় পানি কিনে খেতে হয় অথবা এরকম জায়গা থেকে পানি নিয়ে খেতে হয়। এবং অবশ্যই এইসব পানি দূষিত ও পানিবাহিত রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী। এত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর যে দেশ, ইরাবতী নদীর মতো এত দীর্ঘ একটা নদী যে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, যার এত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, যে দেশে ২০০টির বেশি বড় ড্যাম থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রপ্তানি করা হয়, সে দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য সুপেয় পানির অভাব, তা ভাবতেই আমার কেমন লাগছে। অথচ আমি জানি, শহুরে মানুষরা চলতে-ফিরতে এই সুপেয় পানির অভাবের সাথে অসুবিধা করে হলেও মানিয়ে নিয়েছে। যেমনটি পানি ও পাবলিক টয়লেটের অভাবের সাথে অত্যন্ত অস্বস্তিকরভাবে মানিয়ে নিয়েছে ঢাকা শহরের মানুষ।

আমার মনের ভেতর যখন এইসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন আমি লক্ষ করলাম ৯-১০ বছরের কয়েকটি ছেলে, মাথা ন্যাড়া এবং ভিক্ষুদের কাপড় পরা একটা ছোট্ট মুদির দোকানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে একটা করে সবুজ বোতল। সেইসব বোতলের ভেতর খুব সম্ভব কার্বোনেটেড ড্রিংক। তাদের কথা বলার ধরন এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম এরা সবাই বেশ মজা করে একসাথে এই পানীয়গুলো কিনেছে এবং বেশ জমিয়ে গল্প করতে করতে এগুলো খাবে। আমি যে জানালায় বসেছি তার সামনেই সবুজ বোতল হাতে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ট্রেনের যাত্রীদের দেখছিল। আমার সাথে চোখাচুখি হতেই আমি তার হাতের বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা। ছেলেটা আমার মুখের ভাষা বুঝল না কিন্তু বুঝতে পারল আমি এর দামটা জিজ্ঞেস করেছি। সে হাত দিয়ে দেখাল তিরিশ। আমি সাথে সাথে তার হাতে তিরিশ টাকা দিয়ে বললাম, আমাকে ওই দোকান থেকে একটা বোতল এনে দাও। সে দৌড়ে টাকা হাতে যেতে যেতে দেখি ট্রেন ছেড়ে দিতে শুরু করেছে। ছোট ছেলেটির মাথায় হঠাৎ বোধ হয় বুদ্ধি খেলে গেল। সে দৌড়ে আমার দিকে এসে আমার হাতে ওর নিজের কেনা বোতলটা ধরিয়ে দিতে ছুটে এলো। আমার মনে হয় আমিও মরিয়া হয়ে ছিলাম এতটুকু ভাব আদান-প্রদানের জন্য। একজন দোকানদারের কাছ থেকে একটা কিছু কেনা আর একজন অচেনা শিশু ভিক্ষুর হাত থেকে কিছু নেওয়ার মধ্যে একটা তফাত আছে। আমি শিশু ভিক্ষুর হাত থেকে পানীয় গ্রহণের মায়া পূর্ণমাত্রায় অনুভব করলাম হাসতে হাসতে।

আমার এভাবে কোমল পানীয় কেনার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল সেই আমেরিকান মেয়েটি। তারও প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছিল। আমি অর্ধেক খেয়ে বাকি অর্ধেক ওকে সাধলাম। সে দুই ঢোঁকে বোতল শেষ করে দিল। এর মধ্যে আমি লক্ষ করলাম, এক জোড়া চোখ পাশের সিটে বসে তাকিয়ে আছে। আমার সাথে আমেরিকান মেয়েটির কথা শুনছিল। লোকটির বয়স ৫০ হবে বোধ হয়। শরীরের গড়ন সুন্দর। একটা ঢিলা সবুজ রঙের হাতকাটা গেঞ্জি পরা আর একটা থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট। বাঁ হাতের কবজি থেকে বাইসেপ পর্যন্ত ট্যাটু করা। চোখে চোখ পড়তেই লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি বললাম, বাংলাদেশ থেকে। সে আমেরিকান মেয়েটিকেও একই প্রশ্ন করল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, বাংলাদেশ বার্মা ব্রাদার্স। আমি একটু অবাক হলাম। কারণটা হলো আমি যতদূর জানি বার্মিজরা বাংলাদেশিদের পছন্দ করে না রোহিঙ্গাদের কারণে। তারা মনে করে রোহিঙ্গারা বাঙালি এবং বাংলাদেশ থেকে এসে এরা অবৈধভাবে মিয়ানমারের নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে চায়। এই লোকটির মাধ্যমে আমার বোধ হয় সেই ধারণাটি কিছুটা ভাঙতে শুরু করেছে। আমি তার সাথে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম নিজে থেকে পরের প্রশ্নটি করে। জিজ্ঞেস করলাম তার ট্যাটুর কথা, সে কী করে, কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি। লোকটি মিয়ানমারের ন্যাশনাল টিমে খেলত একসময়। এখন ফুটবল খেলা শেখায় বাচ্চাদের। সে তার ট্যাটুটা করিয়েছিল আরো যুবক বয়সে এবং এখনো তার এটা নিয়ে কোনো আফসোস নেই। ট্যাটুটা দেখানোর জন্য সে নাকি খোলামেলা পোশাক পরে–একথা বলতে বলতে সে সরলভাবে হাসল।

> গত দুই দিন আমি যে শহর দেখে এসেছি তার সাথে ইয়াঙ্গুন শহরের সীমানায় কী আছে তার কোনোই মিল নেই। সুন্দর সুন্দর গেটওয়ালা একতলা-দোতলা বাড়ি এই দৃশ্যপটে একেবারেই অনুপস্থিত বলা চলে। ট্রেনের লাইন ঘেঁষে বস্তির পর বস্তি, মাঝে মাঝে বাজার, কালভার্ট, পরিচর্যার অভাবে পড়ে থাকা খোলা মাঠ, যেখানে-সেখানে হঠাৎ কোনো উঁচু গাছ, প্যাগোডা, খোলা জায়গা।

আমি এই প্রবীণ খেলোয়াড়কে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে আপনি বাংলাদেশকে ভাই মনে করেন, এদেশের সবাই কি এরকম মনে করে? নাকি শত্রুভাবাপন্ন চোখে দেখে? সে উত্তর দিল, রোহিঙ্গারা তো বাঙালিই, তাতে কি? আমরা তো তাই বলে বাংলাদেশকে শত্রু রাষ্ট্র মনে করি না। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই খেলোয়াড় ছাড়াও বার্মিজ একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের সাথে দেখা হয়েছিল গতকাল, যিনি বার্মিজদের কাছে সমাজের প্রগতিশীল, জনদরদি ও খোলা মনের মানুষ হিসেবে পরিচিত। যিনি ২০১১ সালের আগ পর্যন্ত গণতন্ত্রকামী এবং প্রতিবাদী শিল্পী হিসেবে সামরিক শাসন চলাকালে ইংল্যান্ডে নির্বাসনে ছিলেন। আগের দিনই তাঁর সাথে আমার আলোচনা হয় রোহিঙ্গা বিষয়টি নিয়ে। এবং একই প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে করে তাঁর কাছ থেকেও যা জানতে পারি তাতে বুঝতে পারলাম, গণতন্ত্রচর্চা এবং মানবাধিকার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন এরকম অনেক রাজনৈতিক কর্মী, যাঁরা নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বলে পরিচয় দেন, তাঁরা এখন পর্যন্ত বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জাল ছিঁড়তে পারেননি। তাঁরা যদিও মনে করেন রোহিঙ্গারা নিপীড়িত এবং নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাঁরা কেউ স্পষ্ট বাক্যে বলতে চান না যে রাষ্ট্রের উচিত রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুবিধা দেওয়া।

শুধু তা-ই নয়, তাঁরা আরো মনে করেন, রোহিঙ্গারা বাঙালি এবং নাগরিক সুবিধা পাওয়ার আগে তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখানো উচিত। উল্লেখ্য, বার্মিজ সরকার ইচ্ছা করেই রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুবিধা যাতে দিতে না হয়, তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের পথটি ইচ্ছাকৃতভাবে দুরূহ করে রেখেছে। নাগরিকত্ব প্রদানের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, নাগরিকত্ব প্রার্থীকে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারির আগে মিয়ানমারে বসবাস করতে হবে এবং নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত

করেছে ১৯৮২ সালের পরে–এমন হতে হবে। আর পূর্ণ নাগরিকত্ব তাদেরই আছে, যাদের পূর্বপুরুষ ১৮২৩ সালের আগে থেকে মিয়ানমারে বসবাস করে আসছে। সমস্যা হচ্ছে, রোহিঙ্গারা এরকম প্রমাণসহ কাগজ দেখাতে পারে না অনেক ক্ষেত্রেই, কারণ ওই সময় তাদের বসবাসের প্রমাণের কোনো নথি তারা দেখাতে পারে না এবং যেহেতু তাদের ১৯৪৮ সালে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি, তাই তাদের ছেলেমেয়েরাও নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক আলোচনা হলেও নাগরিকত্ব প্রদানের শর্ত মিয়ানমার কোনোভাবেই শিথিল করেনি এবং এর কারণে মিয়ানমারে বসবাসরত ১৩৯টি সম্প্রদায়ের মধ্যে রোহিঙ্গারা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমার ধারণা ছিল, মিয়ানমারে প্রগতিশীল মানবাধিকারকর্মীরা হয়তো রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে নমনীয়। কিন্তু মানুষজনের সাথে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে ক্রমেই আমার মধ্যে এই ধারণাটি স্পষ্ট হচ্ছে যে এমনকি সবচেয়ে প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত মানুষদেরও অদূর ভবিষ্যতে এই উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের শিকল থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মনে পড়ে গেল ২০১২ সালে রাখাইন প্রদেশে হত্যা-লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগের শিকার হয়ে যখন রোহিঙ্গারা আমাদের দেশে এসে আশ্রয়ের জন্য নৌকায় করে পৌঁছাচ্ছিল, তখন তাদের অনেকের সাথে কথা বলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কেন একটা দেশে এই জনগোষ্ঠীর পাশে মিয়ানমারের কেউ জোরালোভাবে দাঁড়াচ্ছে না। অং সান সু চি তো নয়ই, এমনকি গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক কর্মীদেরও আমার কাছে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড উদাসীন মনে হয়েছে। মিয়ানমারে স্যাফ্রন আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা নেতারাও তখন জোরালো কোনো অবস্থান নেননি। আমার মনে আছে, এ নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটা লেখা জমা দিতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম, 'যখন নির্যাতিত রোহিঙ্গারা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশে পৌঁছাচ্ছে, তখন গণতন্ত্রের আইকন নোবেল বিজয়ী অং সান সু চি ইংল্যান্ডে বসে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপনে ব্যস্ত।' সেই লাইনটি ছাপানো হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছিল মিষ্টি ভাষায় মৃদু সমালোচনা।

আমি সেই খেলোয়াড়ের মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারি যে ২০১৫ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারে যে নির্বাচন হবে তার জন্য যে কায়দায় আদমশুমারি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে কেউ কেন জোরালো বক্তব্য দিচ্ছে না। এই আদমশুমারিতে রোহিঙ্গাদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তা দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের গণনায় ধরা হবে না–এমনটাই নির্দেশ দেওয়া আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত যখন এই আদমশুমারি নিয়ে তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করে, তখনো সরকার আদমশুমারিতে রোহিঙ্গা পরিচয়ে তাদের গণনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই অবিচার বা বৈষম্য একটা দেশ কিভাবে মেনে নেয় তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। ট্রেনে এই খেলোয়াড়ের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, আমাদের কাছে যা বৈষম্য মনে হয় তারা তাকে বৈষম্যই মনে করে না, নিজেদের স্বার্থেই।

৩.

এক বন্ধুর মাধ্যমে ফেসবুকে আমার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল একটি বার্মিজ মেয়ের। মেয়েটি থাইল্যান্ড ও কোরিয়ায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিল এবং পড়াশোনা শেষ করে ফিরে এসেছে মিয়ানমারে। থাকে ইয়াঙ্গুনে এবং ওই সময় যখন আমি ইয়াঙ্গুনে ছিলাম তখন সে ছিল বেকার এবং তার এক বছরের শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি ইয়াঙ্গুনে এসে তার সাথে যোগাযোগ করি, এবং সে আমার সাথে হোটেলে দেখা করতে আসে। আমি লাউঞ্জে বসে ছিলাম, মেয়েটি এসে আমাকে খুঁজে বের করল। প্রথমেই বলে রাখি, আমি এই মেয়েটি সম্পর্কে যা ধারণা করেছিলাম ফেসবুকে পরিচিত হয়ে, তার সাথে মেয়েটির তেমন কোনো মিল নেই। সে একজন আর্মি অফিসারের স্ত্রী। কাজেই তার থাকার কথা ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের কোনো একটা বাড়ির মতো বাড়িতে। বিদেশে পড়াশোনা করে দেশে ফেরার কারণে তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা আত্মবিশ্বাসী সত্তা আছে। আমি আরো ভেবেছিলাম, এই মেয়েটির সাথে পরিচিত হয়ে আমি এদেশের শাসক শ্রেণির মেয়েদের সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারব। কিন্তু কী যে হলো। মেয়েটা যখন আমাকে নিতে হোটেলে এলো তখন বুঝলাম, মেয়েটি একজন সাধারণের চেয়েও সাধারণ মানুষ এবং মিয়ানমার সম্পর্কে আমি যতটুকু খোঁজখবর রাখি, সে ততটুকুও রাখে না। তার প্রমাণ পেলাম তার সাথে কথা বলতে গিয়ে।

> এত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর যে দেশ, ইরাবতী নদীর মতো এত দীর্ঘ একটা নদী যে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, যার এত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, যে দেশে ২০০টির বেশি বড় ড্যাম থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রপ্তানি করা হয়, সে দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য সুপেয় পানির অভাব, তা ভাবতেই আমার কেমন লাগছে।

যেহেতু আমি ঠিক করেছি কারো নাম প্রকাশ করব না, তাই ধরে নিলাম এই মেয়েটির নাম চো। চোয়ের চুল বাদামি রং করা। কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল আর তার অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝলাম, সে চুলের ভালো যত্ন নেয়। পরেছে একটা ঢিলেঢালা হাতাকাটা টপ আর গোড়ালির ওপর পর্যন্ত লম্বা জিন্সের প্যান্ট। সহাস্যে যখন আমার সামনে এসে বসল, দুই মিনিট কথা বলেই বুঝে গেলাম সে বাচ্চা লালন-পালন করতে করতে খুব ক্লান্ত এবং আমার সাথে দেখা করতে এসে একঘেয়েমি থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি ঘটেছে বলে সে বেশ উৎফুল্ল। এই অনুভূতিটা চট করে বুঝে গিয়ে আমরা অল্প সময়ের জন্য প্রথম দেখার জড়তাটা কাটিয়ে উঠলাম। চো আমাকে প্রস্তাব দিল, নদীর পারে ডকইয়ার্ডের রেস্টুরেন্টে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি আগে থেকেই ম্যাপ দেখে জেনে রেখেছিলাম ইয়াঙ্গুন শহরের দক্ষিণে এই নদীর পারে এই শহরের কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিক্ট। আর নদীর পারে বেড়ানোর জায়গাও খুব সীমিত। তাই চোকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিলাম আমরা কোথায় যাব।

আমরা গাড়িতে করে ইয়াঙ্গুন নদীর পারে একটা রেস্টুরেন্টের বড় পার্কিং লটে নামলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি পুরনো ডিজাইনের বেশ উঁচু ছাদওয়ালা একটা বিশাল হলরুম। বোঝাই যায় এই জায়গাটা আগে অনেক কারণে ব্যবহার করা হতো। এখন এটা একটা রেস্টুরেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নদীর পারে হবার কারণে এই জায়গাটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। অদূরেই নোঙর করা ছোট ছোট বোটের দিকে তাকালে মনে হবে রুমের ভেতরটাও একটা ছোট জাহাজের অংশ। জানালাগুলোয় লোহার গ্রিল দেওয়া বিশাল রুমটায় ৩০ থেকে ৪০টি টেবিল ঘিরে বসার আয়োজন। পুরনো কাঠের সস্তা চেয়ার আর টেবিলের ওপর সস্তা প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথ বিছানো। বোঝা যায় এটা খুব দামি কোনো জায়গা নয়। এবং মেনু দেখে

বুঝতে পারলাম, যে হোটেলে আমরা আছি তার খাবারের দামের তিন ভাগের এক ভাগ দাম এখানে। বিকেলবেলা সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। নদীর পানির ওপর চিকচিক করছে পড়ন্ত বিকেলের আলো। আমি চোয়ের সাথে গল্প শুরু করলাম।

এখানে আসতে আসতে রাস্তায় চো বলছিল, তার কাছে ইয়াঙ্গুন শহরটা অনেক বড় আর অচেনা মনে হয়। সে তুলনায় ব্যাংকক বা কোরিয়ার শহর তার কাছে বেশি ভ্রমণযোগ্য মনে হয়। ইয়াঙ্গুনের কোথায় কী আছে সে খুব ভালো জানে না। অল্প বয়স থেকে মা-বাবা তাকে খুব বেশি একা বের হতে দিতেন না। প্রথম যখন সে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে যায় তখন সে থাইল্যান্ডে পড়তে গিয়েছিল। তার ইচ্ছা সে একটা স্কুল খুলবে মিয়ানমারের কোনো অনুন্নত অঞ্চলে অথবা সে কোনো এনজিওতে কাজ করবে। হঠাৎ আমার মনে হলো তাকে জিজ্ঞেস করি, অং সান সু চিকে সে কী চোখে দেখে। তার বক্তব্য অন্য বার্মিজ নাগরিকদের চেয়ে আলাদা নয়। সু চির পার্টি ক্ষমতায় এলেও সু চি যে কখনোই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না তাঁর পরিবারের সদস্য বিদেশি নাগরিক হওয়ায় এবং সমস্যা যে মিয়ানমারের সংবিধানে, সে কথাটার ওপরই সে গুরুত্ব দিল বেশি। আমি লেতপাদং কপার মাইনের কথা তুললাম। লেতপাদং কপার মাইনিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকে এবং সেখানে যখন সু চি গিয়ে জনসমক্ষে প্রতিবাদকারীদের আন্দোলন থামিয়ে এবং জমি দখল মেনে নিতে উপদেশ দেন, তখন সু চি স্থানীয় জনতার বিক্ষোভের রোষানলে পড়েছিলেন। এই ঘটনার পর সু চি সম্পর্কে মানুষের ধারণা আদৌ পরিবর্তন হয়েছে কি না জানতে চাইলে চো একটু অস্বস্তি বোধ করে বলে, এ বিষয়ে আমি তেমন খবর রাখি না। কপার মাইনিং সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এ থেকে বুঝলাম, চোয়ের কোনো দোষ নেই। আমাদের দেশের বিদেশ-ফেরত অনেক তরুণ শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী যেমন ফুলবাড়ী আন্দোলন, রামপাল পাওয়ার প্লান্ট বিরোধী আন্দোলন, চা বা পাট শ্রমিকদের আন্দোলনের সম্পর্কে উদাসীন অথচ আমেরিকার অকুপাই মুভমেন্ট কিংবা গ্রিসের অস্টারিটি বিরোধী আন্দোলন নিয়ে হইচই করে, তেমন এদেশেও এমন সুশীল সমাজ রয়েছে, যারা বিদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরোধিতা করলেও নিজেদের দেশে জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীনই বলা চলে। এমন নয় যে আমি প্রত্যাশা করছিলাম আমি খুব বেশি কিছু জানতে পারব চোয়ের কাছ থেকে, কিন্তু আমি বুঝতে চেয়েছিলাম চোয়ের মতো মেয়েরা, যারা স্বাধীনভাবে বিদেশে পড়াশোনা করে এবং দেশে ফিরে কোনো এনজিও বা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করবে তারা কিভাবে দেখে বিষয়গুলো।

আমি রাজনীতি-অর্থনীতি বাদ দিয়ে চোকে বললাম, তোমার চুল খুব সুন্দর। চো বলল, আমাদের দেশে আর্মি অফিসারদের স্ত্রীদের বড় চুল রাখা আবশ্যক। কেন জিজ্ঞেস করায় সে হেসে উত্তর দিল, এ কারণেই আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে থাকি না। সে থাকে মিয়ানমারের বর্ডারের কাছে কাচিন স্টেটে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আর্মিদের কোয়ার্টারে গিয়ে থাকতে। আর্মিদের পার্টি হলে আর্মি অফিসারদের স্ত্রীদের একটা বিশেষ কায়দায় চুল বাঁধতে হয় এবং ফুল লাগাতে হয়। আমার সব সময় বড় চুল রাখতে ইচ্ছা করে না, চুল স্টাইল করে কাটতে আমি পছন্দ করি। কিন্তু বছরে দু-একবার এরকম প্রোগ্রামে ছোট চুল নিয়ে গেলে অনেকের অনেক কথা শুনতে হয়। আরো একটা কারণে আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে গিয়ে থাকতে পছন্দ করি না। সেটা হলো সিনিয়র আর্মি অফিসারদের স্ত্রীরা আমাদের দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করায়। যেহেতু আমার হাজব্যান্ড এখনো জুনিয়র এবং তার সামনে অনেক সম্ভাবনা, সিনিয়র অফিসারদের স্ত্রীরা সেটা এক্সপ্লয়েট করে। জুনিয়র অফিসারদের স্ত্রীদের দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ করায়। এবং অনেক স্ত্রী যেচে মোসাহেবি করে নিজেদের হাজব্যান্ডদের প্রমোশনের জন্য। আমার ওখানে ভালো লাগে না। তাই আমি দূরে থাকি। আমার হাজব্যান্ড মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যায় ছুটি হলে।

> এমনকি সবচেয়ে প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত মানুষদেরও অদূর ভবিষ্যতে এই উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের শিকল থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আমি আর চো দুজনে দুটি লেমোনেড খেয়ে উঠে পড়লাম। চো আমাকে নিয়ে যাবে শপিং মলে। শপিং করতে না, একটা বিশেষ দোকান দেখাতে। চো কথায় কথায় বলছিল, এদেশের মেয়েরা কোরিয়ান সোপ অপেরার ভক্ত এবং তারা কোরিয়ান কসমেটিকসের বড় ক্রেতা। আর তাই শপিং মলগুলোতে কোরিয়ান মডেলদের বড় বড় ছবি দিয়ে কোরিয়ান কসমেটিকসের বিজ্ঞাপন করা হয়। চো নিজেও এইসব কোরিয়ান কসমেটিকসের ক্রেতা। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, আমরা জানি চীনের সাথে মিয়ানমারের বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সম্পর্ক অনেক পুরনো। তাহলে চীনকে টপকে কোরিয়া কিভাবে এই বাজার দখল করল? তাই আমার আগ্রহ হলো সেরকম একটা মলে যাওয়ার। চোও রাজি, কারণ তার কিছু কেনাকাটা আছে। এবং আমরা ঠিক করলাম, ওখান থেকে কাজ সেরে আমরা চোয়ের বাসায় যাব। গাড়িতে উঠতে গিয়ে বুঝলাম, চো যে গাড়িটা নিয়ে এসেছে, সেটা তার নিজের নয়। তার এক প্রতিবেশী মাঝে মাঝে এই গাড়িটা অনেকের ব্যক্তিগত কাজের জন্য ভাড়া দেয় এবং নিজে চালিয়ে নিয়ে যায়। চো তাকে আংকেল ডাকে। গাড়িতে উঠে সে আংকেলকে বলল শহরের মাঝে একটা শপিং মলে নিয়ে যেতে। আমার মনে নেই নামটা কী। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শপিং মলে ঢুকে দেখি উজ্জ্বল আলো আর চকচকে ফ্লোর। ছোট শপিং মল হলেও তার মধ্যে রয়েছে একটা গ্লোবাল লুক।

ঢাকা শহরের যে কোনো এস্কেলেটরওয়ালা শপিং মলের চেয়ে এটি ভিন্ন নয়। নিচের তলায় পিজার দোকান, কোরিয়ান চেইন ফুডের দোকান, কোরিয়ান কফি শপ। এস্কেলেটর দিয়ে দোতলায় উঠতেই চোখে পড়ল কোরিয়ান মডেলের একটা বিশাল ছবি। তার পাশেই কসমেটিক স্টোর। চো সেখানে ঢুকে দেখাল শুধু বার্মিজ মেয়েদের কাছে কোরিয়ান মেয়েরা সৌন্দর্যের আইকন না, বার্মিজ ছেলেরাও কোরিয়ান মেয়েদের রূপ, মেকআপ, বাচনভঙ্গি, কাপড়-চোপড়—এসব পছন্দ করে। আর তাই শপিং মলের অর্ধেক বলতে গেলে কোরিয়ান জিনিসে ভরপুর। চো কী যেন একটা কিনল, তারপর বলল বেসমেন্টে তার একটা কাজ আছে। আমি তার সাথে বেসমেন্টে গেলাম এবং গিয়ে দেখি একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর। ঢুকেই চো নিচু হয়ে বসে একেবারে নিচের তাকে রাখা কয়েকটা সিলিন্ডারের দাম তুলনা শুরু করল। একটা ধরে, একটা রাখে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখছ? চো বলল, আমাদের বাসায় গ্যাস চলে গেছে সকাল থেকে। তাই একটা সিলিন্ডার কিনছি।

সিলিন্ডারের আকৃতি একটা শ্যাম্পুর বোতলের সমান। এবং বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এর ভেতর রান্না করার গ্যাস আছে। আমার মনে হলো আমি হোঁচট খেলাম। যে মিয়ানমার দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল একসময়, যে

মিয়ানমার প্রাকৃতিক সম্পদে এত ভরপুর বলে জানি, সেই মিয়ানমারের গুরুত্বপূর্ণ শহরে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িতে গ্যাস নেই। বেশি দাম দিয়ে সুপারমার্কেট থেকে এরকম একটি মেয়েকে গ্যাস কিনতে হচ্ছে। মনে পড়ল মিয়ানমার চীনে গ্যাস রপ্তানি করে এবং শুধু ২০১৩-১৪ সালে মিয়ানমার শোয়ে পাইপলাইন দিয়ে ১.৮৭ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস রপ্তানি করেছে চীনে। শোয়ে গ্যাস ফিল্ড থেকে পরিবহন করে নেওয়া এই গ্যাস বিক্রি করে সামরিক সরকার প্রচুর বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে, অথচ দেশের মানুষকে গ্যাসের অভাবে সুপারমার্কেট থেকে সিলিন্ডার কিনতে হয়। ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে নাইজেরিয়ায়, যেখানে নাইজেরিয়া বিদেশে তেল রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, অথচ শহরের পেট্রোল পাম্পগুলোতে মানুষ গাড়ি নিয়ে লাইন ধরে বসে থাকে, তেল পায় না বলে।

চো কেনাকাটা শেষ করে একটা পিজা অর্ডার দিল। পিজাটার দামও আমার কাছে অনেক বেশি মনে হলো। আমি বললাম, তুমি এটা কেন কিনছ? চো বলল, বাসায় নিয়ে যাই, গ্যাসের অভাবে আমাদের বাড়িতে আজকে রান্না হয়নি। চকচকে লাইটে উদ্ভাসিত শপিং মল থেকে বের হয়ে দেখলাম অন্ধকার নেমে গেছে। চোয়ের বাড়িতে গ্যাস নেই শুনে সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো আমার ভেতর অন্ধকার নেমে এলো। জানতে পারলাম, এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর সাথে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম আমি যদি কান্দাওয়াজি প্যালেস থেকে ঢাকায় ফেরত যেতাম, আমার পক্ষে জানা সম্ভব হতো না কিভাবে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার জীবন কাটায়। তেল-গ্যাসের ওপর ভাসতে থাকা একটা জনপদের আংশিক ছবি নিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

চোয়ের বাবার বাড়িটা নদীর ওপারে। শহরের মধ্যবর্তী অংশে রিয়াল এস্টেটের দাম অনেক। বিশেষ করে বিদেশিরা এসে গত কয়েক বছরে এর দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। গতকালই মিয়ানমারে চাকরি করছে এমন একজন শ্রীলঙ্কান বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম, সে দুই বেডরুমের একটা বাসার জন্য দুই হাজার ডলার ভাড়া দেয়। নদীর ওপারে শহর বিস্তৃত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা নতুন করে সেখানে বসবাস শুরু করেছে। পথে চলতে গেলেই দেখা যায় অর্ধনির্মিত কিছু ভবন। কিছু ভবন রং করা হয়নি। আস্তর দিয়ে কোনোমতে সেখানে থাকা শুরু করে দিয়েছে মানুষ। আরো ২০ বছর আগে উত্তরা যেমন ছিল, শহরের এই অংশটি এখন তেমন। নদীর ওপর ব্রিজ পার হতেই ইয়াঙ্গুন শহরের চিত্র পাল্টে যায়। বহুতল ভবন, শপিং মল, সামনে লনওয়ালা একতলা বাড়ি–এসব থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হয় অন্য একটা পরিবেশে। এখানে মানুষজনের চলাফেরা অনেকটা বাংলাদেশের মতো। বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে পরিবারের লোকজন, বাইরে শিশুরা গলির মধ্যে খেলছে, খেলা শেষ করে বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ভাইবোনকে চিৎকার করে ডাকছে। কারো মধ্যে কোনো অবদমন চোখে পড়ে না। ঢাকা শহরের একটা পাড়া আরো ২০ বছর আগে যেমন ছিল, তেমন একটা পরিবেশ বিরাজ করছে।

চোয়ের বাসার সামনে এসে গাড়ি থামল। জায়গাটা অন্ধকার। একটা চারতলা ভবনের সামনের রাস্তায় চোয়ের ছেলেকে কোলে নিয়ে খেলছে চোয়ের ছোট বোন। আমরা আসতেই চোয়ের ছেলে ওর কোলে উঠে পড়ল। আমি লক্ষ করলাম, বিদ্যুৎ নেই বাসায়। চোয়ের বাবা একটা ইমার্জেন্সি লাইট হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। আমরা সেই লাইটের আলো অনুসরণ করে তিনতলায় উঠলাম। এখানে চোয়ের বাবা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। বাচ্চা হবার পর থেকে চো এখানেই থাকে বেশি। ঘরে ঢুকে দেখি, ৮ ফুট বাই ১০ ফুট একটি রুমে একটা সোফা আর একটা টিভি রাখা। রুমটা আসবাবপত্র রাখার পর এত ছোট লাগছিল যে দুজন মানুষ দাঁড়ালে তিনজন মানুষ দাঁড়ানোর জায়গা হয় না। সোফার সামনে কাচের টেবিলের ওপর একটা অ্যালবাম চোখে পড়ায় আমি দেখতে চাইলাম। ওই ইমার্জেন্সি লাইটের আলোতেই দেখলাম, প্রথম ছবিটা চো আর তার স্বামীর বিয়ের ছবি। চো একটা সাদা গাউন পরা। হাতে ফুল। আর তার স্বামী আর্মির ইউনিফর্ম পরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরকম ইউনিফর্ম পরা কেন? চো বলল, আর্মির পোশাক তো সবাই পরতে পারে না। এই কাজটিকে সম্মান করা হয় বলে সামাজিক স্ট্যাটাসের দিক থেকে দেখলে এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। আর তাই এই কাপড় পরে আর্মিরা এদেশে বিয়ে করতে পছন্দ করে। এই সামাজিক মর্যাদার সাথে আছে অহংকার। এদেশের মেয়েরা আর্মিদের বিয়ে করতে চায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের পরিবার বিয়ের সময় অনেক টাকা-পয়সাও দেয়। আর্মির সাথে বিয়ে দিতে পারলে মেয়ের পরিবার নিজেদের ধন্য মনে করে। আর চোয়ের ক্ষেত্রে নাকি যৌতুক দিতে হয়নি, কারণ চোয়ের স্বামী অনলাইনে চ্যাট করতে গিয়ে চোয়ের প্রেমে পড়ে যায়। তার কাছে যৌতুকের কোনো মূল্য নেই।

আর্মির পোশাক তো সবাই পরতে পারে না। এই কাজটিকে সম্মান করা হয় বলে সামাজিক স্ট্যাটাসের দিক থেকে দেখলে এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। আর তাই এই কাপড় পরে আর্মিরা এদেশে বিয়ে করতে পছন্দ করে।

চোয়ের পরিবার এবং তার বাড়ি দেখে যখন হোটেলে ফিরছি, তখন রাত হয়ে গেছে। আংকেল আমাদের নামিয়ে দিতে গেল। হোটেলে নেমে চোকে বিদায় দিতে গিয়ে আমার মনে হলো, চো তার জীবন, বাসস্থান, দেশকে যেভাবে দেখছে, তার অনেক কিছুই আমি জানি না। কিন্তু চোয়ের মতো মানুষদের ভাগ্য যারা নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো মানুষরা তাহলে কোথায়? আমি তাদের মনে মনে খুঁজছি।

হোটেলে ফিরে দেখি, লাউঞ্জে একজন সাংবাদিকের সাথে আলাপ করছে আমার বন্ধুরা। ইনি একটি ইংরেজি পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। আমেরিকান নাগরিক। সদ্য দেখে আসা মধ্যবিত্তের হালহকিকত তখন আমার মাথায় তাজা। নানা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করছিল। আমি প্রথমে নীরবে শুনছিলাম। একসময় মনে হলো, আমিও কিছু বলি। সেই সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করলাম, মিয়ানমারে এখন কয়টি বার্মিজ ও ইংরেজি পত্রিকা এবং এই পত্রিকাগুলো মধ্যবিত্তের জীবন-যাপন, স্বার্থ–এগুলো কেমন কাভার করে? সে বলল, জানে না। আমি তখন জানতে চাইলাম, আপনি এখানে কবে থেকে সাংবাদিকতা করেন? সে জবাব দিল, সে কখনোই সাংবাদিকতা করেনি এবং মিয়ানমার সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই সীমিত। মিয়ানমারের ইকোনমিক হোল্ডিং, যা মিলিটারি কনগ্লোমারেট দ্বারা পরিচালিত, তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্পর্কে সে তেমন কিছুই বলতে পারল না। বুঝতে চেয়েছিলাম এইসব ইংরেজি পত্রিকার বাজার কেমন এবং কারা সাধারণত বিজ্ঞাপন দেয়। বুঝতে পারলাম, বিদেশি নাগরিক হলে এখানে চাকরি করা খুবই সহজ কাজ। কিছু না জানলেও চলে। এরকম আমাদের দেশেও অনেক আছে। সেই সাংবাদিক কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেল। যাওয়ার সময় হোটেল

থেকে একটা চিজ কেক কিনে নিয়ে গেল। আমার মনে হলো, এইসব চিজ কেক এই দেশের মানুষের জন্য না, এগুলো বানানোই হয়েছে বিদেশি গর্দভ সাংবাদিকদের জন্য।

৪.

মিয়ানমার সফরের শেষ দিনটি ছিল কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া ঘোরাঘুরির দিন। সেদিন আমি আমাদের শ্রীলঙ্কা, হাঙ্গেরি ও ইংল্যান্ডের বন্ধুদের সাথে পুরনো ইয়াঙ্গুনে ঘুরতে যাই। আমাদেরকে মূলত গাইড করছিল এলিস। সে আমাদের প্রথমে নিয়ে গেল একটা আর্ট গ্যালারিতে। সেখানে গিয়ে আমি বেশ আনন্দ পেলাম। এর কারণ এই নয় যে আমি শুধু আর্ট ভালোবাসি, এর কারণ আর্ট বিষয়টাকে এই গ্যালারির মালিক এতটা গুরুত্ব দেয় এবং এতটা আনন্দের সাথে এ বিষয়ে আড্ডা দেয় যে তা দেখে আমি মিয়ানমার সম্পর্কে একটা ভিন্ন চিত্র পাই। গ্যালারির নাম পানদোয়ান গ্যালারি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই দেখা যাবে একটা খোলা বারান্দার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে লুঙ্গি পরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ছাদ থেকে ফ্যান ঝুলছে। গ্যালারি বোঝাই পেইন্টিং। এই গ্যালারির বড় আকর্ষণ হচ্ছে অনেক পুরনো খবরের কাগজে ছাপা হওয়া ছবিসহ ফিচার বা কমিউনিস্ট পার্টির কোনো লিফলেটের পুরনো পাতা এরা সংরক্ষণ করে রেখেছে। এবং সেগুলো তারা বিক্রি করে। এখানে গেলে শুধু বর্তমান শিল্পীদের চিত্রকর্ম না, গত ২০০ বছরের চিত্রকলা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হলো, এখানেও এক আমেরিকান মেয়ে কাজ করে। এক ধরনের ভ্যাগাবন্ড ধরনের মানুষ আছে না, যারা ঘুরেফিরে সবই দেখে, জীবনে যাদের উদ্দেশ্য শুধু ঘুরে বেড়ানো, এই মেয়েটিও সে রকমই একটি মেয়ে। বিদেশিদের দিয়ে এই দেশ ভরে গেছে। এমন কোনো জায়গা পেলাম না, যেখানে কোনো বিদেশি চাকরি করে না।

ইয়াঙ্গুন শহরের মানুষের একটা আড্ডা মারার জায়গা হচ্ছে চায়ের দোকানগুলো। চায়ের দোকান সবখানেই আছে, তবে পুরনো ইয়াঙ্গুনের এই জায়গাটা শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য একটা মিলনস্থল ছিল ১৯৮০-র দশক জুড়ে। রাস্তার ধারে একটার পর একটা চায়ের দোকান। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কাঠের সস্তা টেবিলের চারদিকে চেয়ার দিয়ে বসার ব্যবস্থা। এখানে খুব সস্তায় চা স্ন্যাকস পাওয়া যায়। এই চায়ের দোকানগুলো ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে ১৯৮৮ সালে যে গণতন্ত্রকামী ছাত্র আন্দোলন হয় এবং তিন হাজারের ওপর ছাত্র ও তরুণ মেরে ফেলা হয়, সেই আন্দোলনের শুরু হয় এই চায়ের দোকানগুলোতে একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়েই। পরবর্তীতে সামরিক শাসন চলাকালে এখানে এসে রাজনৈতিক কর্মীরা আড্ডা মারলেও এই আড্ডাখানাগুলো সামরিক শাসকদের নজরদারির মধ্যে থাকত। একটা সময় ছিল, যখন এই চায়ের দোকানগুলোতে মানুষদের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে ফিসফিস করে কথা বলতে হতো। কেউ এখানে কথা বলা নিরাপদ মনে করত না গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে। ২০১২ সালের পর থেকে পরিবেশ আবার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু আগের মতো জমে ওঠেনি আর আড্ডা রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। তরুণ-বুড়ো-ছেলেমেয়ে অনেকেই আসে, কিন্তু আগের মতো উত্তেজনা বিরাজ করে না। সামরিক শাসন চলাকালে গণতন্ত্রকামীদের আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার জন্য অনেক মানুষকে দেশের বাইরে নির্বাসন নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের অনেকেই এখন ফিরে এসেছে, কিন্তু ঠিক আগের মতো তারা একত্রিত নয়। শুনেছি ২০১৫-র নভেম্বরে যে নির্বাচন হবে, সেখানে ৯০টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবে, এর মধ্যে ১৯৮৮ প্রজন্মের ছাত্রনেতাও থাকতে পারে। এ থেকে মনে হচ্ছে, বিচ্ছিন্নভাবে তারা একই শহরে থাকে আবার একই সূত্রে কোথায় বাঁধা যেন।

পরদিন আমাদের ফিরে আসার দিন। মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন শহর দেখে মিয়ানমারকে চেনার সুযোগ একেবারেই নেই। তার পরও আমার অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক যাওয়া দিয়ে আমি কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করেছি। যেদিন ফিরে আসব, সেদিন প্লেনে উঠে দেখি আমার পূর্বপরিচিত একজন বড় ভাই প্লেনে উঠে বসে আছেন। উনাকে দেখেই আমি পাশে গিয়ে বসলাম। ব্যাপার কী খোঁজখবর করতেই জানতে পারলাম, উনি ব্যবসার সুযোগ খুঁজতে সেখানে গেছেন। উনি একজন তরুণ ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে ভালোই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এযাবৎ। পড়াশোনাও করেন বিস্তর। খোঁজখবর রাখেন দিন-দুনিয়ার। উনাকে দেখে আমি আবার প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলাম। উনি আইসিটি সেক্টরে ব্যবসা করেন মূলত। মিয়ানমারে ফাইবার অপটিকের মার্কেট যাচাই করতে গিয়েছিলেন। মিয়ানমারে এখন অনেক কনসাল্টিং ফার্ম গড়ে উঠেছে, যারা জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবসা নিয়ে তথ্যসেবা, যোগাযোগ তৈরি, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। উনি সেরকম একটি ফার্ম মারফত জানতে পেরেছেন, বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে ব্যবসায় পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হলো মিয়ানমার বাংলাদেশের ওপর বিশ্বাস বা আস্থা তৈরি করতে পারেনি। সেদিক থেকে চীনের সাথে ব্যবসার ইতিহাস পুরনো বলে এখন যা নতুন ব্যবসার সুযোগ হচ্ছে, সেখানে চীনাদের টপকে মাঠে নামা বাংলাদেশিদের জন্য দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তরুণ কৌশলী ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বললেন, এখন বাংলাদেশের মিয়ানমারে ঢোকার একমাত্র উপায় হচ্ছে চীনকে সাথে নিয়ে মাঠে নামা অথবা চায়নিজ কম্পানিকে দিয়ে দেশি সেবা বা পণ্য কেনানো।

মনে পড়ল তৌফিক-ই-ইলাহীর প্লেনে ওঠা দিয়ে শুরু হয়েছিল আমার মিয়ানমার সফর। এবং শেষ হলো আরেক ব্যবসায়ীর সাথে কথোপকথনে। এর মানে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে ভালোভাবেই। এখন অনেক মানুষই মিয়ানমারে যায়। হঠাৎ চোখে ভেসে উঠল রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়া নর্দমার দৃশ্য, অস্বাস্থ্যকর টয়লেট, মাটির পানিতে রাখা দূষিত খাবার পানি এবং ভাঙা ঘরবাড়ি। আরো দশ থেকে পনেরো বছর পর ওই ট্রেনে চড়ে আমি কী দেখব? ইয়াঙ্গুনের চারদিকের শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষদের কি আদৌ কোনো উন্নতি হবে, নাকি সেখানকার জমির দাম চড়া হয়ে গেলে এই মানুষগুলোকে চলে যেতে হবে আরো দূরে? যেমন যেতে হয়েছে চোয়েদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারকে নদীর ওপারে সস্তায় আবাসন খুঁজতে। চোয়ের মতো মেয়েরা শহরে থেকেও শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। যেন এই শহর অন্য কারো। কার? কোনো বিদেশি সাংবাদিকের, কোনো বিদেশি এনজিওকর্মীর, অথবা যার টাকা আছে তার?

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক
ইমেইল: moshahida@gmail.com